বাঁশ, বেত পাতা ও শোলার কাজ



Approved and Prize awarded by the Ministry of Education, Government of India, New Delhi (Vide Letter No. 19-33/55/B2, Dated 2-12-55)

বাঁশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি. এ.
অধ্যাপক, বি. পি. পালচৌধুরী টেক্নিক্যাল স্কুল
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

অ শো ক পু স্ত কা ল য়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

মূল্য এক টাকা মাত্র

৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয় হইতে শ্রীস্বপনকুমার বারিক কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
হইতে শ্রীসন্তোষকুমার ধর কর্তৃক মুদ্রিত।

বাঁশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ

—— ⁘ ○ ⁘ ——

প্রথম অধ্যায়

বাঁশ

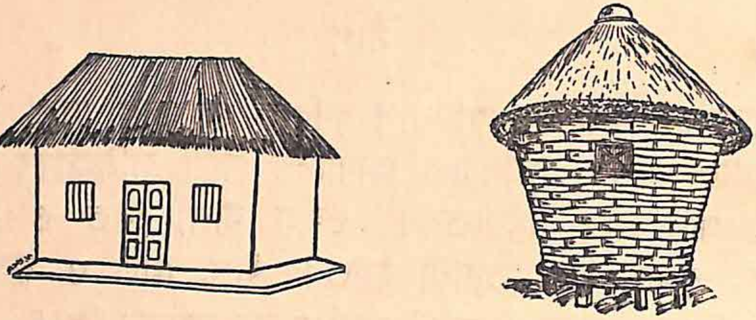
মানুষকে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছে বাঁশ। পূর্বকালে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই খড়ের ঘরে বাস করিতেন। তখন বাঁশ, বেত ও উলুখড় হইলেই সুন্দর ঘর তৈয়ারী হইত। বাঁশ, বেত ও উলুখড়ের অভাব ছিল না দেশে। ঘর তৈয়ারীও খুব সহজে হইত।

কেবল ঘর তৈয়ারী কেন? বাস করিতে হইলে বাঁশ ছাড়া চলিতেই পারে না। বেড়া দিতে, লাঠি তৈয়ারী করিতে, ছোট নদীর বা খালের একপার হইতে অন্যপারে যাইবার জন্য সাঁকো বাঁধিতে, বোঝা বহিবার জন্য বাঁক তৈয়ারী করিতে, মাছ ধরিবার ছিপ, মাচা ও বিবিধ যন্ত্র নির্মাণে বাঁশ অপরিহার্য।

কিন্তু আগেকার দিনে অধিকাংশ লোক পল্লীতে খড়ের ঘরে বাস করিতেন বলিয়াই যে আজ বাঁশের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে, তাহা নহে। শহরের বড় বড় ইমারত তৈয়ারী করিতেও বাঁশের একান্ত দরকার।

চীন ও জাপানে কুটীর-শিল্পে হিসাবে বাঁশের অশেষবিধ ব্যবহার দেখা যায়। জাপানীরা বাঁশের 'বেতি' দিয়া সুন্দর 'ক্যালেণ্ডার' তৈয়ারী করে। শোনা যায়, জাপানীরা নাকি বাঁশ দিয়া এরোপ্লেন পর্যন্ত তৈয়ারী করিয়াছিল!

বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলার নিজস্ব রূপ এই বাঁশের ভিতর দিয়াই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে! আবার বাংলার পল্লীচিত্রের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—খড়ের 'চৌরী' ও 'আটচালা' ঘর, গোলা, পুঁইয়ের মাচা, ময়নার খাঁচা, 'টোকা' মাথায় চাষী, পাচনি হাতে



রাখাল, ডালা, কুলা, চালুনী, নৌকার বৈঠা, তীর-ধনুক—এমন কি, ফুল তোলার সময়েও বালিকাদের হাতে বাঁশের তৈয়ারী ফুলের সাজি দেখা যায়।

বাঁশ তৃণজাতীয় গাছ। আমাদের দেশে অনেক প্রকারের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বাঁশ মোটা ও ফাঁপা, কোন বাঁশ বেশী ফাঁপা নয়, কোন বাঁশ সরু—কোন বাঁশের কঞ্চি বেশী হয়, আবার কোন বাঁশের কঞ্চি খুব কম। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বাঁশ বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়।

'তল্লা' প্রভৃতি এক শ্রেণীর বাঁশ মাটি ভেদ করিয়া সোজা বাহির হয়। ইহারা ঝাড় বাঁধে না এবং ইহাদের কঞ্চিও সরল ও কম। এই শ্রেণীর বাঁশ মাছ ধরিবার যন্ত্র তৈয়ারী করিতে প্রয়োজন হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে আবার সরু ও মোটা দুই রকমের বাঁশ আছে। সরু বাঁশকে কোথাও কোথাও তরু বাঁশ বলা হয়। ইহা দ্বারা

ছিপ, ছাতার বাঁট প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। 'মূলী' বাঁশের সুন্দর বেড়া হয়। বাঁশটিকে একবার চিরিয়া উহাকে চাপিয়া ধরিয়া দা দিয়া এমন করিয়া ফালি দিতে হয় যেন উহা সংবদ্ধভাবে থাকে। তারপর ঐগুলির বুনানী করিয়া লইতে হয়।

ভাল্কো বাঁশ ঝাড় বাঁধিয়া উঠে। ইহা মোটা ও ফাঁপা হয়। ঘরের বেড়া করিতে (কাঁচা, ছাঁচ প্রভৃতি নাম) এই বাঁশের ব্যবহার খুব দেখা যায়। গোয়ালাদের দুধ ও ঘোল অথবা কলুদের তেল মাপিবার পাত্রও তৈয়ারী হয় এই বাঁশে। পাহাড় অঞ্চলের এই শ্রেণীর বাঁশকে অত্যন্ত মোটা হইতে দেখা যায়।

তল্লা বা ভাল্কো বাঁশে ভালো লাঠি হয় না। লাঠি হয় 'জাওয়া' বাঁশে। খুঁটি প্রভৃতি শক্ত কাজেও এই বাঁশ ব্যবহৃত হয়। এই বাঁশ কম ফাঁপা কিন্তু বেশ শক্ত।

আসবাব-পত্র তৈয়ারীর জন্য কোন গাছ কাটিবার পূর্বে উহা কেমন 'সারী' অর্থাৎ সারযুক্ত কিনা, তাহা দেখিতে হয়। বাঁশ কাটিবার পূর্বেও সেইরূপ ঐ বাঁশ কাঁচা না পাকা, তাহা দেখা দরকার। কাঁচা বাঁশ কাটিতে গেলে উহা ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ শব্দ হয় এবং ঐ বাঁশের ভিতরের রং হয় সাদা। কিন্তু পাকা বাঁশে কুড়াল বা দা দিয়া আঘাত করিলে খট্ খট্ শব্দ হয়, উহার বর্ণও কতকটা লাল্চে ধরণের দেখা যায়। অস্ত্র দিয়া আঘাত না করিয়াও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাঁশ দেখিয়াই উহা পাকা কি কাঁচা বলিতে পারেন। কাঁচা বাঁশের গোড়ার দিকটা হয় চক্চকে ও ফিকে সবুজ, কিন্তু পাকা বাঁশের গোড়াটা হয় গাঢ় সবুজ বা মেটে রংয়ের। উহার মাঝামাঝি জায়গা হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত লালাভ হয়।

কাঁচা কাঠে যেমন সহজেই ঘুণ ধরে, কাঁচা বাঁশেও সেইরূপ

সহজে ঘুণ ধরিতে পারে। এইজন্য কাঁচা বাঁশ দিয়া দীর্ঘস্থায়ী কোন কাজ করিতে নাই।

কাঠকে কাজে লাগাইবার পূর্বে যেমন উহা 'সিজনীং' করিয়া লইতে হয়, বাঁশকেও সেইরূপ 'পানেট্' করিয়া লওয়া দরকার। পানেট্ করিয়া লইলে বাঁশে সহসা ঘুণ ধরিতে পারে না এবং উহা স্থায়ীও হয়। পাকা বাঁশ কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া উহা জলের মধ্যে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলেই 'পানেট্' বা 'সিজনীং' হইয়া যায়।

বড় বড় নদীতে দেখা যায়—হাজার হাজার বাঁশ এক সঙ্গে বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। বাঁশগুলি ভাসিয়া নদীর স্রোতের সঙ্গে চলিতে থাকে। পাছে বাঁশগুলি কোথাও আট্‌কাইয়া যায় এইজন্য উহার উপর রক্ষকও থাকে। তাহারা ঐ বড় বড় আঁটির উপর হোগ্‌লা বা উলুখড়ের 'ছই' বাঁধিয়া বাস করে। বাঁশগুলি স্রোতের বেগে ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, তাহারা উহার উপর রান্না করে, ঘুমায়। এইভাবে দিনের পর দিন নানাদেশ ও বিভিন্ন 'মোকাম' দেখিতে দেখিতে অবশেষে তাহারা নিজেদের গন্তব্যস্থানে বাঁশ লইয়া পৌঁছায়। বাঁশগুলিও এতদিন জলে থাকিয়া 'পানেট্' হইয়া যায়।

বড় বড় গাছ কাটিবার পূর্বে যেমন ঐ সব গাছের ঝোঁক কোন্ দিকে বুঝিয়া এবং আবশ্যকমত মোটা দড়ি বাঁধিয়া গাছ কাটিতে হয়, বাঁশ কাটিবার পূর্বেও সেইরূপ কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রথম—উহা পাকা বাঁশ কিনা দেখিতে হইবে। এজন্য বাঁশটির যে কোনও জায়গার বাকলটি (চাঁচ) তুলিয়া ঐ স্থানের রং দেখিলেই বুঝা যাইবে। বাঁশ পাকা হইলে উহাতে লাল্‌চে রং ধরিয়া থাকে।

দ্বিতীয়—ঝাড়ালো কঞ্চিযুক্ত বাঁশ হইলে উহা কাটিবার পর বাহির করা যাইবে কিনা দেখিতে হইবে এবং অন্য বাঁশের সহিত জড়ানো কঞ্চিগুলিকে আগে কাটিয়া লইয়া তারপর বাঁশটিকে কাটিবে। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে অনেক সময় বাঁশ কাটিয়া পরে উহা আর বাহির করা যায় না।

তৃতীয়—বাঁশ কাটিবার সময়ে আর একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। বাঁশটি যদি 'হেলা' অর্থাৎ একদিকে 'কাত' হইয়া থাকে, তাহা হইলে কখনও উহার উপর দিক হইতে অস্ত্রের আঘাত দিয়া উহাকে কাটিতে চেষ্টা করিবে না। কারণ, তাহা হইলে ঐ কাটা-জায়গা হইতে হঠাৎ বাঁশের উপরের অংশটা ফাড়িয়া গিয়া জোরে উপরের দিকে উঠিতে পারে এবং ঐরূপ আকস্মিকভাবে উঠিবার সময় যে কাটিতেছে তাহার চিবুক বা মাথায় সজোরে আঘাত লাগিতে পারে। সেইজন্য এইরূপ কাত হইয়া পড়া বা 'নুইয়ে পড়া' বাঁশ কাটিতে হইলে আগে উহার নীচের দিক হইতে কাটা উচিত।

কথায় বলে, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"। অবশ্য সব বাঁশের কঞ্চিই দড় বা কার্যকরী নয়। তল্লা বাঁশের কঞ্চি সরল হয় এবং তাহা দিয়া মজবুত কোন কাজ করাও চলে না; কিন্তু ভাল্‌কো, জাওয়া প্রভৃতি বাঁশের কঞ্চি ঝাড়ালো হয় এবং ইহাদের পাকা কঞ্চি দিয়া অনেক কাজ হইতে পারে। এই সব বাঁশ তাহার কঞ্চির জোরে ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অগ্রাহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এমন কি, অনেক সময় বাঁশ কাটিবার সময় দেখা যায়, উহার কঞ্চি অপরাপর বাঁশের সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে, ঐ বাঁশটিকে কাটিবার পর হাজার টানিয়াও উহা বাহির করা সম্ভব হয় না।

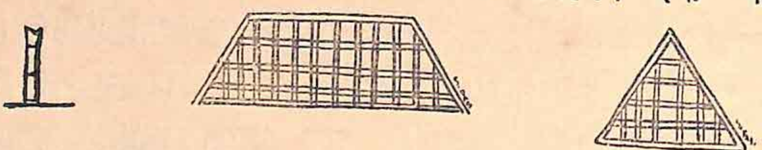
তখন বাধ্য হইয়া বাঁশটির যতখানি পারা যায় কাটিয়া আনিতে হয়। অবশিষ্ট অংশ ঝাড়ে থাকিয়া শুকাইতে থাকে।

বাঁশের পাকা কঞ্চি কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া উহা কয়েকদিন জলে রাখিয়া 'পানেট্' করিবার পর এই সব কঞ্চি চিরিয়া উহা দ্বারা ঝুড়ি, চালুনি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। কঞ্চির সবুজ ফালি দিয়া অনেক সময় কাঁটার বেড়াও বাঁধা হইয়া থাকে। কঞ্চি না চিরিয়া উহার কাঠি দিয়া সুন্দর বেড়াও তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

বাঁশের কাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ কুড়াল, মুগুর, বাটালী, দা, হাত-করাত, তুরপুন ইত্যাদি।

বাঁশ দিয়া তৈয়ারী জিনিস-পত্র ঃ ঘর বাঁধিতে—খুঁটি, রোওয়া বা রুয়া, আটন, ছাটন তৈয়ারী হয়।

খুঁটি—(ক) ইহা যতখানি উঁচু হইবে বাঁশ হইতে ততখানি অংশ কাটিয়া উহার মাথায় দুই দিকে (কলম কাটার মত করিয়া) ইংরাজী 'ডি' (D) অক্ষরের মত কাটিতে হইবে। (খ) মাঝারী



আকারের মোটা, নীরেট ও পাকা বাঁশ কাটিয়া ঘরের চালের রোওয়া বা রুয়া করিতে হয়। (গ) দুই রুয়ার মাঝখানে থাকে উহার সমমাপের আটন। (ঘ) রোওয়া এবং আটনের উপর দিয়া লম্বালম্বিভাবে থাকে ছাটন। খুঁটি দিয়া ঘর, নদী পার হইবার 'সেতু' বা সাঁকো, মাচা প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়।

লাঠি— দুই রকমে তৈয়ারী হইতে পারে। আস্ত বাঁশ হইতে অথবা মোটা নীরেট বাঁশ ফাড়িয়া উহা হইতেও লাঠি তৈয়ারী হয়।

বেশী মোটা নয় এমন নীরেট, গিঁটযুক্ত ও পাকা বাঁশ কাটিয়া উহা হইতে পরিমাণমত পাঁচ-ছয় হাত লম্বা লাঠি করা যাইতে পারে।



মোটা নীরেট বাঁশ হইতে যে লাঠি হয়, তাহা দ্বারা চাষীরা গরু তাড়ানোর কাজ করিয়া থাকে।

ছিপ—মাছ-ধরা ছিপও অনুরূপভাবে দুই রকমেই হইতে পারে। 'তল্লা' প্রভৃতি সরল বাঁশ হইতে সরু ও পাকা বাঁশ কাটিয়া ছিপ করা হয়। এই ছিপে 'হুইল' বসাইয়া মাছ ধরে। নীরেট বাঁশ ফাড়িয়াও তাহা হইতে ছিপ তৈয়ারী করা যায়। সাধারণ ছিপ এইরূপেই তৈয়ারী করে।

ছাতার বাঁট—বিশেষ শ্রেণীর সরু বাঁশ হইতে আবশ্যকমত অংশ কাটিয়া লইয়া উহার যে দিকে বাঁকাইতে হইবে, তাহার মধ্যে বালি পূরিয়া দিয়া আগুনের উত্তাপে বাঁকানো হয়।

ছিপের বাঁশও অনেক সময় সরল না হইলে উহার যেখানটায় বাঁকা, সেখানে গোবর-মাটি মাখাইয়া আগুনের উত্তাপে ধরিয়া চাপ দিলেই সোজা হইয়া যায়।

বাঁশ চেরাই—কৌশল জানা না থাকিলে বাঁশ চেরাই সহজ নয়। বাঁশ চিরিতে হইলে প্রথমে উহার কঞ্চিগুলি বাঁশের গা হইতে ভালো করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর বাঁশটিকে মাটিতে ফেলিয়া উহার গোড়ার দিকের গিঁটে একজন কুড়ালের ফলা চাপিয়া ধরিবে। কুড়ালের হাতলটি তাহার দুই হাতের মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা থাকিবে। মাথাটি যেন একটু সরাইয়া রাখা হয়—যেন মুগুরের আঘাত না লাগে। অপর জন মোটা শক্ত মুগুর দিয়া ঐ

কুড়ালের ফলার গোড়ায় জোরে আঘাত করিবে। গিঁটটি ফাড়িয়া গেলে ঐ কুড়ালের ফলা জোরে বাঁশের মাথার দিকে টানিবে অথবা কুড়াল তুলিয়া লইয়া পরবর্তী গিঁটটিও ঐভাবে ফাড়িয়া লইবে।

এইবার বাঁশটিকে উল্টাইয়া উহার দ্বিখণ্ডিত অংশের এক অংশ মাটিতে ও অপর অংশ উপরের দিকে রাখিয়া উহার মধ্যে কুড়ালের ফলা রাখিয়া চাড় দিতে হইবে। চাড় দিলে যখন ফাঁক হইবে তখন তাহার মধ্যে মুগুরটি ঢুকাইয়া দিতে হইবে। বাঁ-পা দিয়া বাঁশটিকে চাপিয়া ধরিয়া এবং দুই হাত দিয়া কুড়ালের হাতল শক্ত করিয়া ধরিয়া ক্রমশ কুড়ালের ফলাটিকে সজোরে কোলের দিকে টানিতে ও কুড়ালে চাড় দিতে হইবে। অপর একজন ঐ মুগুরটি ক্রমশ দুই ফাঁকের মধ্যে মাটির সহিত সমান্তরাল রাখিয়া সরাইয়া দিতে থাকিবে। এইভাবে কুড়াল দিয়া চাড় দেওয়ার সময় সশব্দে ঐ বাঁশের গিঁটগুলি এক এক করিয়া ফাটিয়া যাইবে।

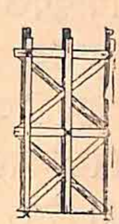
বাঁশটির অর্ধাংশ এইভাবে ফাড়া হইলে কুড়াল ও মুগুর সরাইয়া রাখিয়া দুই পা বাঁশের নীচেকার অংশে রাখিয়া দুই হাত দিয়া উপরের অংশটি উপরের দিকে জোরে তুলিয়া ধরিলে ক্রমশ বাঁশটি দুই ভাগ হইয়া যাইবে। এই সময়ে সাবধান হইতে হইবে, বাঁশের ধারাল অংশে যেন হাত কাটিয়া না যায়।

বাঁশের এইরূপ দ্বিখণ্ডিত অংশকে পুনরায় ফালি দিতে হইলে উহার গোড়ার মুখটি কুড়াল দিয়া দুই ভাগ করিয়া এক অংশ মাটির সহিত পা দিয়া চাপিয়া ধরিবে; অপর অংশ দুই হাত দিয়া ধরিয়া উপরের দিকে জোরে ধাক্কা মারিলেই উহা দ্বিখণ্ডিত হইবে। প্রয়োজন মত উহাকে এইভাবে আরও ফালি দেওয়া যায়। একটা বাঁশে কয়টা ফালি হইবে তাহা নির্ভর করে বাঁশটি কতখানি মোটা তাহার উপর

এবং উহা ফাড়িয়া যাহা তৈয়ারী হইবে তাহাই বা কতখানি মোটা হইবে তাহার উপর।

ঘর তৈয়ারীর পর চালাঘরের জন্য চাই বেড়া। বাঁশের বেড়া অনেক রকমে করা যায়। বেড়া যতখানি খাড়াই বা উঁচু হইবে,

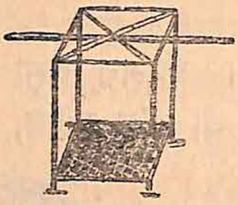




তদনুসারে বাঁশ কাটিয়া লইয়া বাঁশটির একদিক চিরিয়া উহার ভিতরের গিঁটের উঁচু অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। বাঁশটিকে ফালি ফালি করিয়া দা দিয়া চিরিয়া এবং একটা গোল বাঁশের উপর ঐ চেরা বাঁশটিকে উল্টাইয়া ধরিয়া দা দিয়া গিঁটগুলি পরিষ্কার করা যায়—অথবা হাত-কুড়াল দিয়াও ঐ গিঁটগুলি কাটিয়া ফেলা চলে। ফালি দেওয়া বা দায়ের মাথা দিয়া চেরা এইরূপ আস্ত বাঁশের বেড়াকে কোথাও কোথাও 'কাঁচা' বলে। 'মূলী' বাঁশের ফালিতে বুনানী দিয়া একরূপ সুন্দর বেড়া হয়। বাঁশের বাখারী বা কঞ্চির বেড়ায় মাটির প্রলেপ দিয়া উহা শুকাইলে গোবর-মাটি দিয়া লেপিয়া দিলে (বা চূণকাম করিলে) সুন্দর বেড়া হইতে পারে।

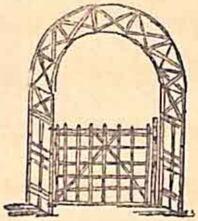
ডুলি—পল্লী-অঞ্চলে এখনও ডুলি ব্যবহৃত হয়। ডুলি বাঁশ দিয়া তৈয়ারী করে। একটি ছোট 'চারপায়া' বা 'খাটিয়া'র মত তৈয়ারী

করিয়া তাহার চারিটি পায়া হইতে আড়াআড়িভাবে বাঁশের শক্ত

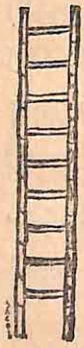


কাঠি লাগাইতে হয়। একটা ফাঁপা, হাল্কা অথচ শক্ত বাঁশ উহার ভিতর দিয়া বরাবর চালানো থাকে। এই বাঁশের দুই দিক বাহকেরা কাঁধে করে। ডুলি কাপড় দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হয় এবং সাধারণত দুইজন বাহকেই ডুলি বহন করে।

শহর-ই হউক আর পাড়াগাঁ-ই হউক 'গেট' সাজাইতে বাঁশ লাগিবেই। দুইটি করিয়া বাঁশ পাশাপাশি পুতিয়া উহার উপর ফোকরের মধ্যে বাথারীর দুই মুখ দুই দিকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে। ঐ দুইটি থিলানের আকারে ঘুরানো বাথারীর সহিত অন্য সরু এবং ছোট বাথারী ইংরাজী 'এক্স্' অক্ষরের আকারে বাঁধিয়া দিলে দেখিতে সুন্দর হইবে।



মই—মই আমাদের অনেক সময়ই দরকার হয়। সামিয়ানা বা পাল বাঁধিবার সময় কিংবা কোনও উঁচু জায়গায় উঠিতে হইলে মই

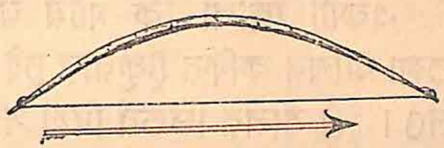


না হইলে চলে না। চাষীরা চাষ-দেওয়া জমিতে মই দিয়া মাটি সমান করে। পাড়াগাঁয়ে রান্নার চালাঘরে খুঁটির সঙ্গে মই ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে বাঁধিয়া উহার উপর ভাতের হাঁড়ি, রান্নার কড়াই প্রভৃতি রাখা হয়।

'মই' তৈয়ারী করিতে হইলে একটি মোটা নীরেট বাঁশকে সমান দুই ভাগ করিয়া চিরিয়া মইটি যতখানি লম্বা হইবে তদনুসারে অংশ কাটিয়া লইতে হইবে। এই দুইটি ফালিকে পাশাপাশি রাখিয়া বার-চোদ্দ ইঞ্চি অন্তর উভয় খণ্ডেই দাগ দিয়া লও। এইবার হাতুড়ী এবং বাটালী লইয়া ঐ খণ্ড

দুইটির দাগ দেওয়া জায়গায় চৌকা করিয়া এ-পাশ ও-পাশ ছিদ্র কর। বাঁশের বাখারী হইতে কতকগুলি খিল তৈয়ারী করিয়া ঐ খিলগুলি দুইদিকে চৌকা-ছিদ্রগুলির মধ্যে ঢুকিতে পারে এমনভাবে সরু করিয়া লও। খণ্ডিত ফালির উভয়টিরই উপরের অংশ মইয়ের ভিতরের দিকে থাকিবে। ঐ খিলগুলি হইবে মইয়ের সিঁড়ি।

তীর-ধনুক—আদিম যুগের অস্ত্র তীর ও ধনুক। প্রাচীনকালে সকল দেশেই তীর-ধনুকের প্রচলন ছিল। আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে ভদ্র সমাজে তীর-ধনুকের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি জাতিরা আজও ধনুর্বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকে।



তীর-ধনুক বাঁশ দিয়াই তৈয়ারী হয়। ধনুক তৈয়ারী করিতে হইলে নীরেট ও পাকা বাঁশের গোড়ার দিক হইতে ফাড়িয়া ফালি বাহির করিতে হইবে। ধনুকটি যত বড় হইবে তদনুসারে ঐ ফালির অংশ কাটিয়া লইয়া উহার দুই দিক পাতলা করিতে হয় এবং মধ্যস্থল পুরু রাখিতে হয়। এই দুই মুখ বাঁকাইয়া ছিলা পরাইলেই ধনুক তৈয়ারী হইবে। বাঁশের কাঠি দিয়া তীর তৈয়ারী হয়।

পিচকারী—বাঁশ দিয়া ভালো পিচকারী তৈয়ারী হইতে পারে। পিচকারীটি যতখানি মোটা হইবে তদনুসারে পাকা তল্লা বাঁশের এক 'ফাঁপ' বা দুই দিকে গিঁটবিশিষ্ট এক অংশ কাটিয়া লও। পরে উহার একদিকের গিঁট করাত দিয়া কাটিয়া ফেল। যে মুখে গিঁট রহিল ঐ গিঁটের মাঝখানে তুরপুন বা পেরেক দিয়া একটি ছিদ্র কর।

এইবার বাঁশের সরু এবং শক্ত একটি কাঠি লও। ঐ কাঠির

মাথায় এমনভাবে কাপড়ের ফালি জড়াও যেন উহা ঐ বাঁশের ফোকরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে।

জলের (বা রংয়ের) বালতির মধ্যে পিচকারীর ঐ ছিদ্রযুক্ত গিঁটওয়ালা মুখ ধরিয়া ডান হাত দিয়া ঐ কাপড়-জড়ানো কাঠিটি আস্তে আস্তে টানিয়া লইলে পিচকারী বোঝাই হইয়া জল উঠিবে। এইবার ঐ কাঠিটিকে সম্মুখ দিকে জোরে ধাক্কা দিলেই গিঁটটির ছিদ্রপথে ফিন্‌কি দিয়া জল ছুটিবে।

ঠিক এই উপায়ে 'খেলনা বন্দুক'ও তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

একটা ছোলা কি মটর কলাই ঢুকিতে পারে এমন ফাঁপা তল্লা বাঁশের কঞ্চির টুক্‌রার দুই গিঁটের মাঝখানের অংশটা কাটিয়া লও। ঐ নলের ভিতর দিয়া সহজে উঠা-নামা করিতে পারে এমন একটি কাঠি তৈয়ারী কর। ঐ নলের মুখে জিউলি, আস্‌শ্যাওড়া, কি অনুরূপ কোনও ফল দিয়া কিংবা কাগজের টুক্‌রা জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া 'গুলি' পাকাইয়া ঐ কাঠি দিয়া নলটির শেষ প্রান্তে ঢুকাইয়া দাও। তারপর আর একটা অনুরূপ ফল বা কাগজের 'গুলি' ঐ নলের মুখে দিয়া কাঠি দিয়া জোরে ধাক্কা দিলেই বাতাসের চাপে নলের মাথার ফল বা গুলিটি সশব্দে বাহির হইয়া যাইবে।

একটা বাঁশের লগির মাথায় জালের বুনানীর থলে লাগাইয়া লইলে আমপাড়া লগি তৈয়ারী হয়। বাঁশ দিয়া নৌকার বৈঠা এবং পাটাতন



তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আস্ত বাঁশ সমান দুই ভাগ করিয়া ফাড়িয়া উহা হইতে নৌকার বিস্তৃতির মাপ অনুসারে কাটিয়া লইয়া পাতিয়া দেওয়া হয়।

রণ-পা বাঁশ দিয়া তৈয়ারী হয়। আগেকার দিনে বাঁশের রণ-পা'য়ে চড়িয়া বা লাঠিতে ভর দিয়া ছুটিয়া ডাকাতরা ডাকাতি

করিত। দুইখানি লাঠির মত সরু শক্ত বাঁশ লও। মাটি হইতে উহার এক হাত বা দেড় হাত উঁচুতে খানিকটা (৪—৬ আঙ্গুল) কঞ্চি রাখিয়া কাটিয়া দাও। এই কঞ্চিতে ছেঁড়া কাপড় জড়াইয়া উহার দুইখানির উপর দুইটি পা রাখিয়া এবং হাত দিয়া ঐ বাঁশের লাঠির উপরাংশ ধরিয়া চলিতে শেখ। এই রণ-পা'য়ের সাহায্যে খুব দ্রুত চলা যায়।

বাঁশ দিয়া বিভিন্ন রকম খেলনাও তৈয়ারী করা যায়। দুই হাত লম্বা একটি বাঁশের বাখারী লও। উহার দুই মাথায় একটি করিয়া এইবার ছিদ্র কর। বাখারীটি বাঁকাইয়া উহার ঐ ছিদ্র দুইটির মধ্যে পাকানো সুতা কিংবা সরু দড়ি টান্ টান্ করিয়া বাঁধ। এইবার পাতলা কোন কাঠ বা শোলা দিয়া একটি পুতুল তৈয়ারী করিয়া ঐ পুতুলের হাত দুইটি ঐ দড়ির সহিত আঁটিয়া লও। এখন চটা দুইটি ধরিয়া টিপিলেই পুতুলটি তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইবে।



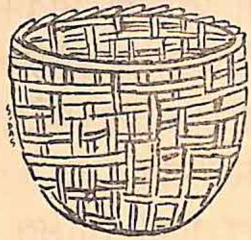
সরু বাঁশ দিয়া 'ফ্লুট বাঁশী' বা 'আড় বাঁশী'-ও তৈয়ারী হয়।

ঝুড়ি ও ঝাঁকা—বাঁশের কঞ্চি হইতে ঝুড়ি তৈয়ারী হয়। ঝাঁকা তৈয়ারী হয় বাঁশের বেতি বা সরু ফালি হইতে। 'পানেট্' করা পাকা বাঁশ হইতে সরু ফালি তুলিয়া জেলেরা সুন্দর মাছের ঝাঁকা তৈয়ারা করে।

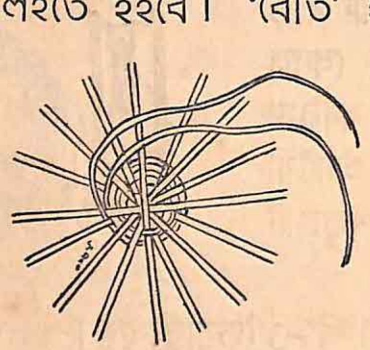
ঝুড়ি বনিতে হইলে সরল এবং পাকা 'জাওয়া' বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া দুই-তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তারপর ঐ কঞ্চিগুলি চিরিতে হইবে। চিরিবার সময় ঐ কঞ্চির মোটা অনুসারে চার বা ছয়টা ফালি দেওয়া প্রয়োজন। তারপর ঝুড়ির আকার

অনুসারে আবার দেড় হাত বা দুই হাত লম্বা 'থিউটি' বা 'জাসি' তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে।





জো—একটি দড়ি ধরিয়া মাটিতে বৃত্ত আঁকিয়া লও। এই বৃত্তের ব্যাস ধর—দেড় হাত। 'থিউটি'ও দেড় হাত লম্বা করিয়া লইতে হইবে। 'বেতি' হইবে কঞ্চির দৈর্ঘ্য অনুসারে দশ-পনর



হাত লম্বা। 'থিউটি' হইতেছে ঝুঁটিটিকে মাটিতে রাখিয়া বুনানী আরম্ভ করিবার সময়কার ব্যাস, আর 'বেতি' হইতেছে যে লম্বা কঞ্চির ফালিটি দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনানী করা হয়। পূর্ব হইতে মাটিতে বৃত্ত করিয়া লইবার উদ্দেশ্য—তাহাতে ঝুড়ির কেন্দ্র ধরা সহজ হয় এবং 'থিউটি'গুলিও ছোট-বড় হইতে পারে না। ফলে ঝুড়িটি বেশ গোল হয়।

বুনানী—প্রথমে ক, খ, গ, ঘ চারিটি থিউটি লও। ক থিউটির উপরে খ, গ, ঘ'র নীচে দিয়া একটা বেতি ঢুকাইয়া উপর-নীচে করিয়া বুনিয়া যাও। তিন-চারি আঙ্গুল বুনিবার পর থিউটিগুলি উল্টাইয়া দাও। তারপর আরও চারিটি থিউটি চ, ছ, জ, ঝ—ঐ পূর্বেকার ক, খ, গ, ঘ থিউটির পরস্পর দূরত্ব বা ফাঁকগুলির মধ্যে পূরিয়া লও।

এইবার ঝুড়ির পিঠের অর্থাৎ সবুজ দিকটা তোমার বুকের দিকে রাখিয়া এবং ঝুড়ির খোল সম্মুখে রাখিয়া ঝুড়িটিকে বাম পাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ডান হাতে দুইটি লম্বা বেতি লইয়া খিউটি-গুলির সহিত উপর ও নীচ করিয়া বুনিয়া যাও।

বুনানী শেষ হইলে একটা বাঁশের 'কাবারী' দিয়া 'চাক' তৈয়ারী করিয়া ঐ ঝুড়ির মুখে গোল করিয়া বাঁধিয়া দাও। মুখের ঐ গোল 'কাবারী'টায় কয়েকটি আল্‌গা বাঁধন দিয়া খিউটির উঁচু মাথাগুলি ক্রমান্বয়ে ডানদিকে বাঁকাইয়া দিয়া বেত দিয়া শক্ত বাঁধন দিয়া দাও।

বাঁশের 'বেত্তি' বা ফালি—ডালা, কুলা, মাছের খালুই, চালুনী, ঢাক্‌নী, ফুলের ঝাঁপি প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে বাঁশের বেতি তুলিতে হয়। বেতির জন্য তল্লা বাঁশই প্রশস্ত।

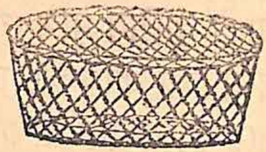
প্রয়োজনমত আস্ত বাঁশ হইতে 'ছে' (section) বা খণ্ড কাটিয়া লইয়া ঐ বাঁশের খণ্ডগুলিকে আবার বেতি যতখানি চওড়া হইবে তদনুসারে আট, বার বা ষোল খণ্ডে লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া লওয়া দরকার।

এইবার ঐ খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে খাড়াভাবে ধরিয়া বেতি যতখানি পুরু হইবে তদনুসারে উহার উপর 'দা'র ফলা রাখিয়া মুগুর বা ডান হাতের তালু দিয়া ঘা মারিয়া বেতি বা ফালি বাহির করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে বাঁশের উপর পিঠ বা সবুজ দিক হইতে সারাংশের দুই-চারিটি ফালি পাওয়া যাইবে। ঐ খণ্ডগুলির বুকের দিকটায় থাকে সাদা—অসারাংশ। ইহাকে 'বুকো' বা বাঁশের অসার ফালি বলা হয়। ইহা দিয়াও ফলের চুপ্‌ড়ি, খাবার নেওয়ার ছোট চুপ্‌ড়ি প্রভৃতি অল্পকালস্থায়ী পাত্র তৈয়ারী হইয়া থাকে।

সারাংশের ফালিগুলি দিয়া ডালা, কুলা, চালুনী, ঢাক্‌নী, দোলনা প্রভৃতি গৃহস্থের ব্যবহার্য জিনিস তৈয়ারী হইতে পারে।

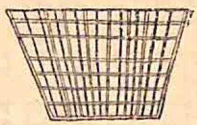
বুনানী—বিভিন্ন জিনিসের বুনানীও বিভিন্ন। একখানি ডালা, কুলা বা চালুনীর বুনানী দেখিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে।





বুনানীর পর উহার বাড়ন্ত ফালিগুলিকে ঘুরাইয়া দুইখানি করিয়া 'চটা'র বা বাঁশের চওড়া ফালির মধ্যে ঐগুলি রাখিয়া বেত দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। ডালার জন্য ঐ বন্ধনী গোল করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। কিন্তু কুলার বেলায় ইংরাজী 'ইউ' (U) অক্ষরের মত করিয়া বন্ধনী দিয়া উহার সম্মুখ দিকটাও আলাদা শক্ত ফালি দিয়া বাঁধা দরকার।

বাঁশের শলাকা বা শলা—ঘরের আটন, ছাটন, মাছ ধরিবার বিবিধ যন্ত্র, মাছ রাখিবার ঝাঁকা, পানের বরোজ প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে বাঁশের মোটা বা সরু শলা ব্যবহৃত হয়।

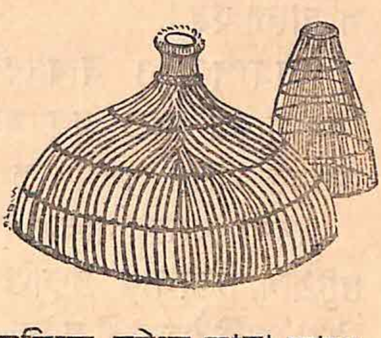


ঘরের আটন বা পানের বরোজ তৈয়ারী করিতে বাঁশের মোটা কাঠি বা শলার দরকার। ছাটন, মাছ ধরিবার পোলো বা 'পাখীর খাঁচা' তৈয়ারী করিতে মাঝারি মোটা বাঁশের কাঠি চাই ; কিন্তু মাছ রাখিবার ঝাঁকা, বাঁশের শোফা, দুধের ঢাক্‌নী, ফাইল বা বাজে কাগজের জন্য ঝাঁকা, চিক প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে চাই খুব সরু

ফালি। এই লম্বা ফালিগুলি তুলিয়া খুব ধারালো ছোট দা (কাটারি) দিয়া সাবধানে উহা গোল করিয়া লইতে হয়।

যাহাতে ফালির ধারে আঙ্গুল কাটিয়া না যায়, সেজন্য ডান হাতের তর্জনীতে ন্যাক্ড়া জড়াইয়া লও। এইবার ফালিগুলিকে সম্মুখে ফেলিয়া একটি একটি করিয়া টানিয়া গোল করিতে হইবে।

গোল করিবার কৌশল—তোমার কোলের দিকের ফালির প্রান্তটি ঐ ন্যাক্ড়া-জড়ানো আঙ্গুলের উপর তুলিয়া ধর। এখন ধারালো ছোট দা'খানির মুখ সম্মুখ দিকে রাখিয়া ঐ ফালির উপর ধর। তারপর আস্তে আস্তে দা'খানির মুখ দিয়া ফালিটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পরিষ্কার করিয়া যাও এবং পরিষ্কৃত অংশ বাঁ-হাত দিয়া টানিয়া কোলের দিকে সরাইতে থাক। মাঝারী আকারের মোটা কাঠিগুলিও ঠিক এইভাবে গোল করিতে হয়; কিন্তু মোটা কাঠি-গুলির বেলায় আঙ্গুলে ন্যাক্ড়া না জড়াইয়া কেবল বাঁ-হাতে কাঠিটি ঘুরাইয়া লইলেই হইবে।



বুনানী—বিভিন্ন জিনিসের বুনানী বিভিন্ন। 'পোলো' তৈয়ারী করিতে হইলে আগে মাথাটি বুনিয়া উহার মধ্যে কলার 'তেড়' বা সরু কাণ্ড ঢুকাইয়া নীচের অংশে বাঁধন দিবে। মাছের ঝাঁকা বা বাঁশের শোফা প্রভৃতির বুনানী আলাদা। যে জিনিস তৈয়ারী করিতে হইবে তাহা আগে দেখিয়া লইলে বুনানী বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেত

পূর্বে আমাদের দেশে যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালার প্রচলন ছিল, তখন ছেলেরা আর কিছু চিনিবার পূর্বে 'বেত'কে ভালো করিয়াই চিনিত। দুষ্ট ছেলেরা পাঠশালায় বেত্রাঘাত সহ্য করিত। তখন দেশে এত সাইকেল বা মোটর গাড়ীর প্রচলন হয় নাই; ঘোড়ার ব্যবহার তখন বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঘোড়া ছুটাইতে সওয়ার চাবুকের বদলে পল্লী-অঞ্চলে বেতই ব্যবহার করিতেন। অপরাধীদের শাস্তিও এখন অন্যরূপ হইয়াছে; পূর্বে কিন্তু সামান্য অপরাধেও 'বেত্রদণ্ডের' ব্যবস্থা ছিল।

বেত লতাজাতীয় গাছ। ইহার গায়ে ও পাতায় ধারালো কাঁটা আছে। বেতের পাতা (ডেগো) দিয়া অনেক সময় সভামণ্ডপ সাজানো হয়।

সিঙ্গাপুরী ও আমাদের দেশী বেতের মধ্যে পার্থক্য আছে। সিঙ্গাপুরের বেত খুব মজবুত ও দীর্ঘ হয়। দেশী বেত বোধ হয় উপযুক্ত মাটির অভাবে তত শক্ত হইতে পারে না।

দেশী বেতের মধ্যেও মোটা ও সরু দুই রকমের বেত দেখা যায়। চট্টগ্রাম, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে মোটা বেত দেখা যায়। এই বেত দিয়া লাঠি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় উৎপন্ন আস্ত বেত দিয়া ধামা, সের, পাল্লা, ঝাঁপি, স্যুটকেশ, চেয়ার ও সোফা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। বেতের ফালি হইতে বাঁশের যাবতীয় জিনিস বাঁধাই করার কাজ

চলে। তাহা ছাড়া, মোড়া, চেয়ার, ইজি চেয়ার প্রভৃতি বেত দিয়াই বুনানী করা হয়।

কুমিল্লা অঞ্চলে এককালে বেতের কাজ প্রসিদ্ধ ছিল। পাকা বেতের সুবিধা এই—ইহা শক্ত অথচ সহজে নমনীয়। বেতের ফালি দিয়া ঘর তৈয়ারী, ঝাঁটা বাঁধা, ধামা, কুলা, ডালা প্রভৃতি বাঁধাইয়ের কাজ হইয়া থাকে।

বেতগাছ বীজ হইতে বা বড় গাছের শিকড় হইতে জন্মিয়া থাকে। অপর কোন বড় গাছকে অবলম্বন করিয়া বেতগাছ বাড়িয়া যায়। ইহার গোড়ার দিকের পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া গেলে তাহার নীচে বেশ সুশীতল আশ্রয় হয়। বাঘ, শিয়াল প্রভৃতি বন্য জন্তু এইরূপ নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে।

বেতের অগ্রভাগের বাকল ফেলিয়া দিলে যে সাদা অংশ (বেতাগ) পাওয়া যায়, তাহা কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার আস্বাদ তিক্ত এবং 'সুক্তো' শ্রেণীর মধ্যে ইহাকে ধরা হয়।

বেত তুলিবার নিয়ম—খালিপায়ে বেত তুলিতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এইজন্য পল্লীগ্রামের লোকেরা তালের ডেগোর গোড়ার দিক দিয়া 'স্যাণ্ডেল' তৈয়ারী করিয়া উহা পায়ে দিয়া বেত তুলিতে যায়।

বেত কাটিবার পক্ষে লম্বা 'হেসো' ধরণের দা-ই সুবিধা। বেতটি পাকা অর্থাৎ পুরাতন কিনা তাহা প্রথমে দেখিয়া লইতে হইবে। তারপর বেতগাছটির গোড়া কাটিয়া কাঁটা ও ডালপালা ছাড়াইয়া খানিকটা ধরিবার জায়গা করা দরকার। ঐ জায়গাটি দুই হাত দিয়া ধরিয়া গাছটিকে হ্যাচকা টান দিলে উহা নামিয়া আসিবে।

এইবার উহার ডালগুলি দা দিয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে চাপ দিলেই পট্ পট্ শব্দ করিয়া খুলিয়া আসিবে। দা দিয়া ঐ ডালগুলি দূরে সরাইয়া দিতে হয়। তারপর আবার হ্যাচ্‌কা টান দিয়া ডালগুলি খুলিয়া পরিষ্কার বেত বাহির করিয়া লওয়া চলে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে টানিয়া বেতটির মাথার কাছে 'অসার' অংশে আসিলে ঐ স্থান হইতে কাটিয়া দিতে হয়।

বেত তুলিবার সময় বেতের 'শীষ' হইতেও সাবধান থাকা দরকার। শীষগুলি দেখিতে সরু তারের মত কিন্তু উহার গায়ে করাতের মত কাঁটা থাকে। এই শীষ কাপড়ে, চুলে, হাতে বা কাণে লাগিয়া গেলে বড় মুস্কিলে পড়িতে হয়। উল্টা দিকে টান দিয়া উহা ছাড়াইতে হইবে।

বেতে 'সীজনীং'—কাঁচা বেতে ঘুণ ধরে বেশী। তাহা ছাড়া উপযুক্ত যত্নের অভাবে বেত শক্ত হইয়া গেলে মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

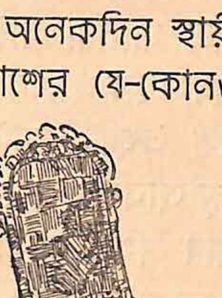
বেত কাটার পর উহাতে চারিটি বা ছয়টি ফালি দিতে হয়। ফালিগুলি দুই-চারি দিন জলে ভিজাইয়া পরে ঠাণ্ডা জায়গায় লম্বা করিয়া আঁটি বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে। যেখানে রান্নাঘরের ধোঁয়া লাগে এমন জায়গায় বেত বা বেতের ফালি রাখিয়া দিলে উহাতে সহজে ঘুণ ধরে না।

'বেতি' তোলা—বেত 'চাছা' বা বেতি তোলার সময় খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিলে বা অন্যমনস্ক হইলে যেমন চরকায় সুতা কাটা যায় না, তেমনি বেত হইতে 'বেতি' তুলিবার সময়ও অসাবধান এবং অমনোযোগী হইলে বেতি তোলা যায় না।

কৌশল—কাঠ বা গাছের ডাল দিয়া ঠিক ইংরাজী 'এ' (A) অক্ষরের মত একটি করিয়া লও। উহা মাটিতে রাখিয়া উহার ভিতর দিয়া একখানি সু-ধার কাটারি দা'র ধারের দিকটা উপরের দিকে রাখিয়া সংযোজক কাঠটি ও দা'খানিকে বাঁ-পা দিয়া চাপিয়া ধর। ডানদিকে বেতের ফালিগুলি রাখ। একটি একটি করিয়া উহা তুলিয়া লও।

প্রক্রিয়া—ফালিটি দুই হাতে ধরিয়া অস্ত্রের ধারে উহার গোড়ার দিকে খানিকটা 'বুকো' তুলিয়া ঠিক করিয়া লও। এইবার ফালিটিকে ঘুরাইয়া তোমার পিছন দিকে দাও। বাঁ-হাত দিয়া উহার বুকটি অস্ত্রের ধারের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতটি দিয়া ফালিটি সম্মুখ দিকে টানিয়া যাও। ভাল করিয়া টানিয়া পরে উল্টো পিঠের সঙ্গে অস্ত্রের ধারটি চাপিয়া ধরিয়া টান দাও।

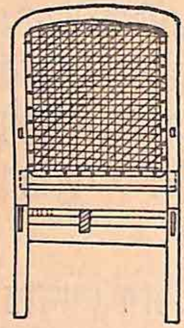
রৌদ্র না লাগিলে এই বেতের ফালির বাঁধন অনেকদিন স্থায়ী হয়। পল্লীগ্রামের চালাঘর তৈয়ারী করিতে, বাঁশের যে-কোনও বাঁধনের কাজ করিতে বেত অদ্বিতীয়। ইহাতে খরচও খুব কম। বাঁশ দিয়া মাছ ধরিবার যন্ত্র তৈয়ারী করিতে, স্যুট্‌কেশ, চেয়ার এবং গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পাখীর খাঁচা প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে বেত একান্ত দরকার।



ইজি চেয়ার বা সাধারণ চেয়ারে বেতের বুনানী দিলে উহা দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, উহার ব্যবহারও তেমনি আরামদায়ক।

আস্ত বেত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করিয়া লইয়া টান্ টান্

করিয়া বাঁধিয়া লইলে উহার উপর ভিজা কাপড় মেলিবার



কাজ চলিতে পারে। মোটা বেতের একদিক বাঁকাইয়া বেতের ফালি দিয়া কিছুদিন বাঁধিয়া রাখিলে উহাতে সুন্দর ছড়ি হইতে পারে।

বাংলাদেশে বাঁশ ও বেত গাছের অভাব নাই। এই বাঁশ ও বেত দিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

ধামা তৈয়ারী—ধামা তৈয়ারী করিতে আস্ত বেতের প্রয়োজন। এজন্য মুচিদের জুতার কাঁটার মত কতকগুলি বাঁশের ছোট থিল এবং কিছু বেতের সরু ফালি চাই।

বেতটির এক প্রান্ত সরু করিয়া লইয়া উহা বৃত্তাকারে বাঁকাইয়া থিল মারিয়া যাইতে হইবে। থিল মারিবার জন্য ও বেতের মধ্যে ছিদ্র করার জন্য একটি সরু ফুড়ানী এবং থিল আঁটিবার জন্য একটি ছোট হাতুড়ী দরকার। বেতটিকে ধামার ছোট-বড় আকার অনুযায়ী বৃত্তাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া থিল মারিতে হয়। থিল মারা হইলে বেতের একটি সরু ফালি দিয়া ধামার উপর প্রান্ত হইতে তলা পর্যন্ত বেশ আঁটিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়।

ওজন করিবার পাত্র বা 'পাল্লা' তৈয়ারী করিতে সরু বেত অথবা মোটা বেত হইলে উহাকে ফালি করিয়া লইয়া অনুরূপ বৃত্তাকারে থিল আঁটিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমনভাবে বুনানী দিয়া যাইতে হয় যেন উহা চ্যাপ্টা হইয়া আসে। তারপর বেতের সরু ফালি দিয়া উহার উপর হইতে মধ্যস্থল বা কেন্দ্র পর্যন্ত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়।

ঢাল-সড়কি ও লাঠিয়াল আজও দেশ হইতে উঠিয়া যায় নাই। পল্লীগ্রামে এখনও ঢাল-সড়কির ব্যবহার দেখা যায়। গণ্ডারের চামড়া দিয়া যে ঢাল তৈয়ারী হয় উহার মূল্য খুব বেশী। পল্লীর চাষীদের উহা কিনিবার সামর্থ্য নাই। তাহারা বেত দিয়া পাল্লা তৈয়ারীর পদ্ধতিতেই ঐ সুন্দর ঢাল তৈয়ারী করিয়া থাকে।

কাঠে আসবাব-পত্র তৈয়ারীর পর যেমন উহাতে পালিশ দিতে হয়, বেতেও সেইরূপ পালিশ বা রং দেওয়া যাইতে পারে। পল্লী-গ্রামের লোকে ধামা, ছোট ধামা, পাল্লা, পেটরা, স্যুট্‌কেশ, চেয়ার প্রভৃতির বেতে গাবের কষ দিয়া পালিশের কাজ করে। উহাতে এক পয়সাও খরচ হয় না অথচ জিনিসগুলি বেশ টেকসই হয়।

কাঁচা গাব পাড়িয়া উহা ঢেঁকিতে চূর্ণ করিয়া একটা পাত্রে রাখিতে হয়। তারপর কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ গাবের রস বেতের যে-কোনও জিনিসে (এবং জালে) দিলে জিনিসগুলি বেশ মজবুত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে ছোট নদী বা খাল পার হইবার জন্য বাঁশের সাঁকো বা সেতু তৈয়ারী হয়। জলের মধ্যে দুইটি করিয়া বাঁশ গুণ চিহ্নের আকারে পুতিয়া উহা আস্ত বেত দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলে খুব শক্ত ও স্থায়ী হয়।

এক খণ্ড পাতলা বেতের ফালি দুই ভাঁজ করিয়া উহার মধ্যে তালপাতা রাখিয়া ফুঁ দিলে সুন্দর বাঁশীর কাজ করিবে। আগেকার দিনে 'পুতুল নাচে' ঐরূপ বাঁশী বাজাইয়া পুতুল নাচ দেখানো হইত।

বাংলার কুটীর-শিল্পে বাঁশ ও বেতের স্থান সকলের উপরে।

তৃতীয় অধ্যায়

পাতার কাজ

গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাজ আছে। গাছের প্রয়োজনের দিক দিয়াই সে-সব কাজের কথা বিজ্ঞানের বইতে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে পাতার কাজ বলিতে আমরা পাতা দিয়া কি কি কাজ করিয়া থাকি, তাহাই বলা হইতেছে।

খড় দিয়া আমরা ঘর তৈয়ারী করিয়া থাকি। খড়ের ঘরকে সাধু ভাষায় 'পর্ণকুটীর' বলা হয়। খড়ের তৈয়ারী ঘর বেশী স্বাস্থ্যকর এবং বেশ আরামদায়ক। শীতকালে খড়ের ঘরের ভিতরের দিকটা বেশ গরম থাকে, আবার গ্রীষ্মকালে উহা থাকে ঠাণ্ডা। কিন্তু খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িবার ফলে দেশে খড়ের জমি কমিয়া গেল। আবার খড়ের ঘর প্রতি পাঁচ-ছয় বৎসর অন্তর নূতন করিয়া ছাওয়াইতে হয় বলিয়া আজকাল উহা ব্যয়-সাপেক্ষ।

কাঁচা খড়ের পাতার রং সবুজ। পাকিলে উহার রং হয় সোনার মত। 'খড়' পাকিলে উহা কাটিয়া আঁটি বাঁধিতে হয়। তারপর একটা বারান্দায় বা কোনও ঘরের বিস্তৃত মেঝেতে ঐ আঁটিগুলির বাঁধন খুলিয়া দিয়া আঁটির মাথা ধরিয়া ছড়াইয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ ছড়ানো খড়ের গাদার উপর লম্বা কাঠ বা বাঁশ দিয়া চাপা দেওয়া দরকার।

এইবার গাদার একদিকে বসিয়া ডান হাত দিয়া খড় টানিয়া ও ঝাড়িয়া বাঁ-হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া আবার আঁটি বাঁধিতে হইবে।

এই খড় দিয়া ঘর তৈয়ারীর মধ্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। যাহারা ঘর তৈয়ারী করে (চাল ছাইয়া থাকে), তাহাদিগকে 'ঘরামী' বলা হয়। বাঁশ, খড় ও দড়ি হইলেই ঘর তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

'চালের' পাশে রাজমিস্ত্রীদের 'ভারা' বাঁধিবার মত বাঁশের ভারা বাঁধিয়া চালের নীচে হইতে খড়ের ছাউনী দিয়া যাইতে হয়। খড়ের গোড়ার দিকের আট-দশ আঙ্গুল কোলের দিকে রাখিয়া তাহার উপর বাঁশের সরু গোল কাঠি (ছাটন) দিয়া চাপিয়া বাঁধিতে হইবে। ঐ বাঁধন ফিরাইবার জন্য চালের নীচে হইতে ফুড়ানী দিয়া একজনকে সাহায্য করিতে হইবে। ছাইবার সময় ঘরামী ক্রমশ উপরে উঠিয়া গেলে তাহাকে খড়ের আঁটি ছুঁড়িয়া দিতে হয়। খড়ের আঁটি ছুঁড়িয়া দেওয়া খুব সহজ এবং নিপুণ ঘরামী উহা বেশ দক্ষতার সঙ্গে ধরিয়া থাকে। চাল ছাওয়া শেষ হইলে 'মট্‌কা' মারিতে হইবে। আমাদের দেশের ঘর ছাইবার প্রণালী বাংলার নিজস্ব সম্পদ। আর কোনও প্রদেশে এইরূপ সুন্দর ঘর ছাইতে পারে না।

খড়ের ঝাড়ু বা ঝাড়ুন—লম্বা ছন-খড় দিয়া ঘর ঝাঁট দেওয়ার ঝাড়ুন তৈয়ারী হইয়া থাকে। ঝাড়ুন তৈয়ারীর মধ্যেও যথেষ্ট শিল্প-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। খড়ের আঁটির মাথা হইতে লম্বা খড়গুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া উহা জল দিয়া ভিজাইয়া লইতে হইবে। খড়পাতার মাথার দিক হইতে খানিকটা দূরে ধরিয়া মাঝামাঝি জায়গায় খুব শক্ত করিয়া ঝাড়ুনের জন্য প্রয়োজনীয় খড়ে বাঁধন দিবে। এইবার খড়ের গোড়ার দিকটায় কতকগুলি করিয়া খড় একসঙ্গে লইয়া ডান হাত দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাকাইয়া লইয়া ঐ বাঁধনের উপর দিয়া যেদিকে খড়গুলির

মাথা সেই দিকে উহার গোড়া ঐ পাতার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া মাথার অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

গোলপাতা—পাতার নাম 'গোলপাতা' হইলেও আসলে কিন্তু উহা মোটেই গোল নয়। সুন্দরবন অঞ্চলে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নারিকেল গাছের মতই এই গাছ, তবে নারিকেল গাছ অপেক্ষা ছোট। নারিকেলের মতই ছোট ছোট ফলও এই গাছে হইয়া থাকে। ইহার পাতা দেখিতে নারিকেল গাছের পাতার মতই, তবে ইহা নারিকেল পাতা অপেক্ষা পুরু ও চওড়া। সুন্দর-বনের সুন্দরী কাঠ প্রভৃতি এই গাছের পাতা দিয়া আঁটি বাঁধিয়া চালান দিতে দেখা যায়। খড়ের চালে যেভাবে ছাউনী দেয়, এই গোলপাতা দিয়া কতকটা সেইভাবেই ছাউনী দিতে হয়। তবে খড়ের চালে খড়ের গোড়ার দিকটা বাহিরে রাখিয়া বাঁধা হয়, কিন্তু গোলপাতার মাথার দিকটা কোলের দিকে অর্থাৎ বাহিরে রাখিয়া ছাইয়া যাইতে হয়।

তালপাতা—তালপাতার ব্যবহার পূর্বে আমাদের দেশে খুবই দেখা যাইত। তখন তালপাতায় পুঁথি লেখা হইত, তালপাতায় পাঠশালার ছেলেরা প্রথম লিখিতে শিখিত। তালপাতায় বসিবার আসন (চাটাই বা চাটকোল) হইত। এখনও তালপাতার টোকা বা মাথাল, পাখা এবং ছোটদের টুপী, ভ্যানিটি ব্যাগ, বড় ব্যাগ প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আধ-পাকা তালপাতা কাটিয়া উহা জলে ভিজাইয়া বা গোবর-জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে টেকসই হয়। পুঁথি, চাটাই বা লিখিবার তালপাতা এইরূপে টেকসই করিয়া লওয়া হয়।

পাখা—পাখার জন্য ডেগোসহ কাঁচা তালপাতা কাটিয়া উহা ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়। তারপর ডেগোটি চিরিয়া পাখার আকারে পাতা কাটিয়া লওয়া দরকার। তারপর ঐ পাতার চারিদিকে গোল করিয়া ঘুরাইয়া বাঁশের সরু শলা সুতা দিয়া বাঁধিয়া এবং প্রয়োজনমত উহাতে রং দিয়া বা নক্সা করিয়া লওয়া চলে।

ব্যাগ, টুপী প্রভৃতি—ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে তালপাতা হইতে প্রচুর ব্যাগ, টুপী, ঝাঁপি প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। পাতাগুলিকে সরু করিয়া চিরিয়া বুনানী দিয়া এই সব তৈয়ারী করে। বিশেষ বিশেষ জিনিসের বিভিন্ন বুনানী আছে। বুনানীর পর ঐগুলিতে রং করিয়া লইতে হয়।

তালপাতার ছাতা, টোকা ও মাথাল—পূর্বে আমাদের দেশে তালপাতার ছাতার প্রচলন ছিল। এখনও কাশীর দশাশ্বমেধঘাট প্রভৃতি স্থানে এই সব বাঁশের মোটা বাঁট-লাগানো প্রকাণ্ড ছাতা দেখা যায়। আমাদের দেশে অত বড় ছাতা ব্যবহৃত না হইলেও পল্লীগ্রামের কোন কোন অঞ্চলে বাঁশের ছোট বাঁটওয়ালা তালপাতার ছাতা ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

টোকা দুই রকমের ব্যবহৃত হয়—গোল ও লম্বা। বাঁশের ফ্রেম্ করিয়া উহার উপর গাবের শুক্‌না পাতা দিয়া পরে তাহার উপর গোল করিয়া তালপাতার ছাউনী দিলে গোল টোকা হইবে। এই টোকা টুপীর মত রোদ্রের সময়ে ব্যবহার করা হয়। লম্বা টোকা কেবল বৃষ্টির সময় রাখালছেলেরা ব্যবহার করে। বাঁশের কাঠের লম্বা ফ্রেমের উপর লম্বা করিয়া তালপাতার ছাউনী দিয়া লইলে উহা দ্বারা ছাতার কাজ চলিতে পারে।

খেজুরপাতা—আধ-পাকা খেজুরপাতা তুলিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়। পরে উহা চিরিয়া তিনটি বা চারিটি পাতা লইয়া বুনানী দিতে হয়। কতকগুলি বুনানীর ফালি জুড়িয়া লইলে খেজুরপাতার পাটি তৈয়ারী হইতে পারে। খেজুরপাতার পাটি চাষী গৃহস্থের অনেক কাজে আসে। এই পাটি বিক্রয় করিয়া নিম্নশ্রেণীর অনেক গরীব লোক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

হোগ্‌লা—হোগ্‌লাও একপ্রকার পাতাবিশেষ। ইহার এক দিক সমতল, আর অপর দিকে মাঝখানটায় শিরা ও উঁচু এবং দুই পাশ ঢালু। ইহা ধানের জমিতে বা সুন্দরবন অঞ্চলে আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে।

হোগ্‌লায় তাঁবু বা সভা-সমিতির 'প্যাণ্ডেল' তৈয়ারী হইয়া থাকে। মাঝিরা হোগ্‌লা দিয়া 'ছই' তৈয়ারী করিয়া নৌকায় আবরণ দেয়। অনেকে উহা দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে লাগাইয়া থাকে।

অস্থায়ী বা সাময়িক প্রয়োজনেও অনেক পাতা ব্যবহৃত হয়। যেমন—কলাপাতা, শালপাতা, দেবদারু পাতা, বেতের পাতা ইত্যাদি।

———

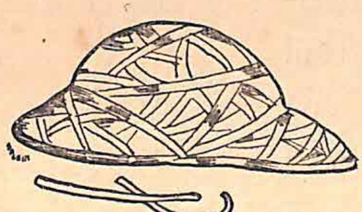
চতুর্থ অধ্যায়

শোলার কাজ

কথায় বলে, হাল্‌কা যেন শোলা। বাস্তবিক শোলার মত হাল্‌কা আর কোন গাছ নাই।

শোলাগাছ জলাজমিতে বা বিলে জন্মিয়া থাকে। ইহার হলুদ রংয়ের ছোট ছোট ফুল হয়।

বিল হইতে শোলা তুলিয়া আনিয়া শুকাইয়া লওয়া দরকার। তারপর উহা সু-ধার অস্ত্রে চিরিয়া উহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করা যাইতে পারে। শোলার প্রধান গুণ ইহা অত্যন্ত হাল্‌কা। ইহাকে সহজেই ফালি দেওয়া যায় এবং ইহা রৌদ্র-নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।



হ্যাট—শোলার 'হ্যাট' টুপী করিতে হইলে প্রথমে একটা বাঁশ বা কাঠের ফ্রেম্ তৈয়ারী করিতে হয়। তারপর ঐ ফ্রেম্‌টির উপর শোলার পাতলা ফালি আঠা দিয়া অাঁটিয়া দিতে হয়। এখন ঐ শোলার উপর এক টুক্‌রা মোটা শক্ত কাপড় লাগাইয়া লইলে সুন্দর টুপী তৈয়ারী হইবে।



মুকুট—খুব ধারাল একপ্রকার ছুরি দিয়া শোলাকে ফালি দিয়া ঐ ফালির সাহায্যে নানা রকম মুকুট তৈয়ারী করা হয়। বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্যে এই সব মুকুট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুকুট তৈয়ারীর মধ্যে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্য আছে। ইহাও বাংলার একটি নিজস্ব সম্পদ।

মায়ের সাজ—শোলা দিয়া লক্ষ্মীর ফুল, চাঁদমালা, ঠাকুরের ছটা ও প্রতিমার বিভিন্ন প্রকারের বিবিধ সাজ তৈয়ারী হইয়া থাকে। রাস-পূর্ণিমায় নবদ্বীপ প্রভৃতি কোন কোন জায়গায় বৃহদাকার ঠাকুর-প্রতিমা হইয়া থাকে। শোলা অতি হাল্‌কা বলিয়া ইহাতে তৈয়ারী প্রতিমা বহিয়া লইয়া যাওয়ার সুবিধা হয়। সেইজন্য এই সব প্রতিমা শোলা দিয়া তৈয়ারী হইয়া থাকে।



শোলার কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মালাকার বলা হয়। পূর্বে আমাদের দেশে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে শোলার বিবিধ সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহৃত হইত। এখন লাউড-স্পীকার প্রভৃতি বিদেশী যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আমরা উৎসবের কাজ শেষ করি। ফলে আমাদের দেশের অনেক দেশীয় শিল্পই ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে।

সম্পূর্ণ